দৈনিক ইত্তেফাক

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার : চ্যালেঞ্জ ও অর্জন

প্রকাশ : ২০ নভেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. শামসুল আলম

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাত্ বেকারত্ব, ব্যাধি, বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তবহির্ভূত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার সংবিধান কর্তৃক মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিশ্রুত। কিন্তু নব্বই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলোর উদ্ভাবন ও বিকাশ হয়েছে কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই—কখনও খাদ্য সংকট, কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে।

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে থাকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে। এসময়ে 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয়' ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত হয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচি, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত হয় সরকারের প্রাধিকার তালিকায়। যাত্রা শুরু হয় 'বয়স্ক ভাতা','বিধবা ভাতা' ও 'মুক্তিযোদ্ধা ভাতার' মতো যুগোপযোগী কর্মসূচির। কিন্তু একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে এসে বিভিন্ন গবেষণার ফল হতে দেখা যায়, সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দারিদ্র্য নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব প্রত্যাশিত মানের চেয়ে কম। শুরু হয় কারণের অনুসন্ধান। দেখা গেল বহুসংখ্যক মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত ততোধিক কর্মসূচি নিয়ে এক জটিল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে দেশে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে

নেই কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা; বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় অধিক্রমণ (ওভারল্যাপ) বিদ্যমান। কিছু কিছু কর্মসূচির আকার এত ছোট ছিল যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উপর এদের প্রভাব ছিল অতি সামান্য। শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না থাকায় একই ব্যক্তি একাধিক কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেত; অনেক দরিদ্র ব্যক্তি পেত না কোনো ধরনেরই সুবিধা। ত্রুটি ছিল সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতিতেও। ২০১০ সালের খানা আয়ব্যয় জরিপ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতাভুক্ত ১৮ শতাংশ পরিবারই ছিল সচ্ছল শ্রেণিভুক্ত, অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল সকল ধরনের কর্মসূচির আওতার বাইরে। ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল না; অথচ এ বয়সের সঠিক পরিচর্যাই নিশ্চিত করে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ।

এ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসের গতিকে বেগবান করার জন্য সরকারের সকল সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় প্রথমবারের মত ২০১৫ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র। এ কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হলো: বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য এবং অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার পাশাপাশি ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। একটি সুসংহত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল—যা দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস করে সকল দরিদ্রের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে। কৌশলপত্রটি ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মূল ব্যবহৃত কাঠামো হিসেবে কাজ করবে একটি জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা। একজন মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে (গর্ভাবস্থায়) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সস্তরের অর্থাত্ জীবনচক্রের পাঁচটি মূল স্তরের (গর্ভধারণ ও প্রাক শৈশবকাল, বিদ্যালয় গমনের বয়স, কর্মজীবনে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে থাকা তরুণ, কর্মোপযোগী বয়স ও বৃদ্ধ বয়স) ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও ঝুঁকির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণীত হয় এ কৌশলপত্র। এছাড়া অনুষঙ্গ ঝুঁকি যা যেকোনো বয়সের যে-কারোর ওপর অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম সে সবের জন্যও থাকবে বিশেষ কর্মসূচি (যেমন—প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা)। বিশেষ কর্মসূচি থাকবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্যও (অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বেদে, জেলে, তৃতীয় লিঙ্গ)।

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় এবং জন্ম-পরবর্তী প্রথম ২৪ মাস শিশুর ভবিষ্যত্ বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টির সংস্থান না পেলে জীবনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য তা বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের জীবনে একটি সুন্দর সূচনা এনে দেবার জন্য সরকার ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য 'শিশু কল্যাণ কর্মসূচি' নামে একটি যুগান্তকারী পরিকল্পের প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মাধ্যমে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই এ কর্মসূচির একটি সময়ভিত্তিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। নগদ অর্থ সহায়তার পরিমাণ ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রাথমিকভাবে ৮৫০ টাকা করা হচ্ছে (যা ২,৩১৮ কিলোক্যালোরি খাদ্য সমতুল্য)। দেশের সকল দরিদ্র মা সর্বাধিক প্রথম দুই সন্তানের (উচ্চ প্রজনন হার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে) ক্ষেত্রে এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা পাচ্ছেন যথাক্রমে ৭ লাখ ও ২.৫ লাখ নারী। পরিপূরক কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকছে গর্ভকালীন সময়ে ৪টি এএনসি ভিজিট (অ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার), ০-২৪ মাসে ৪টি পিএনসি ভিজিট (পোস্টন্যাটাল কেয়ার) ও জন্ম নিবন্ধন, মায়েদের জন্য পুষ্টি শিক্ষা এবং ৪৮ মাস পূর্ণ হলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সূচনার সমর্থনে।

বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রস্তাবনা হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য না করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অতি দরিদ্র শিশুদের ৫০ শতাংশকে উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। নগদ অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে সময়োপযোগী করা এবং একের অধিক শিশু রয়েছে এমন পরিবারের ক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ না কমানো। অবশ্য পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ দুজন শিশু এ উপবৃত্তি সুবিধা লাভ করবে। সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটে ইতোমধ্যেই এ প্রস্তাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। যেমন—প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৯৭০ কোটি টাকা, ১০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৫০ কোটি টাকায়।

তরুণ ও কর্মোপযোগীদের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের মূলে থাকবে কর্মসৃজনমূলক (ওয়ার্কফেয়ার)

কর্মসূচিসমূহের একীভবন ও বেকারত্ব বীমা; পাশাপাশি কর্মোপযোগী নারীদের জন্য থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিমের অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য বেকারত্ব ভাতা চালু করবে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ক গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে বয়স্কদের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা রয়েছে। প্রথম স্তরটি হবে সরকার অর্থায়িত সুবিধা যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সকল বয়স্ক নাগরিকের ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে; চলমান বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটি একটি বুনিয়াদী স্তর প্রতিষ্ঠা করবে। নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বয়সসীমার অবসান ঘটিয়ে দেশের সকল ষাটোর্ধ্ব নাগরিক (যাদের আয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ১.২৫ গুণের মধ্যে) এ ভাতা প্রাপ্য হবেন। ভাতার পরিমাণ চলতি মূল্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হবে। এছাড়া ৯০ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য ভাতার পরিমাণ আরও বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে কৌশলে। ইতোমধ্যে বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ১৯৯৭-৯৮ সালের ১০০ টাকা এবং ২০১৫-১৬ সালের ৩০০ টাকা থেকে ২০১৬-১৭ সালে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গত তিন বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা গড়ে ৫ লাখ জন করে বেড়ে বর্তমানে ৪০ লাখে দাঁড়িয়েছে। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে ষাটোর্ধ্ব সকলের জন্য প্রস্তাব প্রণয়নাধীন রয়েছে এবং নবতিপর বৃদ্ধদের জন্য মাসিক ভাতার পরিমাণ প্রস্তাব করা হয়েছে ৩০০০ টাকা। পরবর্তী বাজেটেই এসকল প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় স্তরটি হবে বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কর্মীদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন কর্মসূচি যা 'জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিম' নামে অভিহিত হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান সহায়তাগুলোকে একীভূত ও সংহত করে জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বিত করার নির্দেশনা রয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে। এ প্রস্তাবনায় তিনটি মূল কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে: ১৮ বছরের কম বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা এবং ১৮-৫৯ বছর বয়সী মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা; ষাটোর্ধ্ব মারাত্মক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণের নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে, প্রস্তুত করা হয়েছে আয়মানদণ্ডসহ বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল। চলতি অর্থ বছরে প্রতিবন্ধী সহায়তার আওতা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা ভাতা পাচ্ছেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ছিল একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মিত একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা একটি একক রেজিস্ট্রির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২টি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তিনটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কর্মসূচিকে প্রাথমিকভাবে ইতোমধ্যে এ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আরেকটি প্রধান সংস্কার প্রস্তাবনা ছিল সরকার থেকে ব্যক্তি পর্যায়ের সরাসরি ভাতা প্রদান ব্যবস্থা (জি২পি পেমেন্ট সিস্টেম) জোরদার করা। এ ধরনের ব্যবস্থা কেবল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিই নিশ্চিত করবে না, রোধ করবে অপচয় ও দ্বৈততা। কৌশলপত্রে বলা হয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এ পর্যালোচনার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রধান প্রধান ভাতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণীত হবে যেখানে জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রসারের রূপরেখা থাকবে। এর ফলে কোনোরকম ঝামেলা ও খরচ ছাড়াই সময়মত ও নিয়মিতভাবে ভাতা গ্রহীতারা নিজেদের দোরগোড়ায় পেয়ে যাচ্ছেন তাদের লভ্য সুবিধা। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে একটি শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নির্মাণের কথাও বলা হয়েছে; যাতে করে বঞ্চিতরা তাদের বঞ্চনার কথা জানাতে পারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মসহ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় কেবল সামাজিক নিরাপত্তা নয়, সরকার প্রতিশ্রুত যেকোনো সেবা, সেবার মান বা সেবা প্রদান পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন নাগরিকরা।

আশা করা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে দেশের অতিদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সকলকেই নিয়ে আসা যাবে সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আচ্ছাদনে। আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে কেবল পরিকল্পনা প্রণয়নেই নয়, এর বাস্তবায়নেও সুদক্ষ এই সরকার। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে সে সময় দরিদ্র পরিবারগুলোর ১৩ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত

ছিল যা বর্তমানে ২৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সফল নেতৃত্বের বাস্তবায়ন দক্ষতা এক্ষেত্রে প্রমাণিত।

n লেখক:অর্থনীতিবিদ ও সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।